"আমি আছি! আমি নেই!"

Yasin Sazid

BSSE 10th bactch

আমার প্রিয় রং কী? নীল। একই প্রশ্ন যদি একটা পাথর খণ্ডকে জিজ্ঞাসা করা হয়? কোন উত্তর পাওয়া যাবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন যদি একটা ইঁদুরকে জিজ্ঞাসা করা হয়? বা একটা গাছকে? আপনি নিশ্চয় আমাকে পাগল ভাবছেন। কিন্তু প্রশ্নটি কি একেবারেই অমূলক?

আমরা অধিকাংশই মনে করি আমাদের শরীর ও মন আলাদা দুইটি সত্ত্বা। আমরা মনে করি যে একদিকে আমাদের শারীরিক বা ফিজিক্যাল বা বস্তুগত অস্তিত্ব আছে, আবার আমিত্ব বা চেতনা বা আত্মার অস্তিত্ব আছে। ফরাসি দার্শনিক রেনে দেকার্ত এমনটাই মনে করতেন। তিনি মনে করতেন – মানুষের শরীর ও আত্মা বা আমিত্ব আলাদা দুই অস্তিত্ব। একে কার্তেসিয়ান ডুয়ালিজম (কার্তেসীয় দ্বৈততা) বলা হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মানব মস্তিষ্ক সম্পর্কে যত তথ্য পাওয়া গেল, ততই দেকার্তের এই দ্বৈততা প্রশ্নবিদ্ধ হতে লাগল। আধুনিক বিজ্ঞানীরা দ্বৈততা বা ডুয়ালিজমে বিশ্বাস করেন না। কারণ মানব মস্তিষ্ক একটি শারীরিক অঙ্গ। আবার সকলেই মস্তিষ্ককে চেতনা ও আমিত্বের উৎস হিসেবে স্বীকার করেন। তাহলে শরীর ও আত্মা আলাদা হয় কি করে? দেকার্তের বিখ্যাত উক্তি – ‘আমি চিন্তা করি তাই আমি আছি।’ কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মানুষের সকল চিন্তা-চেতনার উৎপত্তি মস্তিষ্কে আর মস্তিষ্ক মানেই শারীরিক বা বস্তুগত অস্তিত্ব। তাহলে দ্বৈততা বলে তো কিছু পাওয়া গেল না। আবার মনে করি, দ্বৈততা বলে কিছু নেই। তাহলে আমাদেরকে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হবে, কার্তেসীয় থিয়েটারকে অস্বীকার করতে হবে। অথচ মানুষের আমিত্বের অনুভূতি এতই জোরালো যে তাকে এত সহজে অস্বীকার করা যায় না। এটা একটা জটিল সমস্যা। কিন্তু যত যাই হোক, বিজ্ঞান দ্বৈততা মানে না। আসুন পাথর ও ইঁদুরের গল্পে ফেরত যাই। আপনি বলবেন – পাথরের বস্তুগত অস্তিত্ব থাকলেও চেতনা নেই। অর্থাৎ আমি যদি পাথর হতাম তাহলে আমার কোন অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা থাকত না। তাই পাথরের কাছে প্রশ্ন করা অমূলক। কিন্তু বিজ্ঞান বলে – চেতনার উৎস বস্তুগত অস্তিত্ব থেকে। তাহলে পাথরের চেতনা আছে কি নেই সেটা কি নিশ্চিত করে বলা যায়? আপনি বলবেন – পাথরের মস্তিষ্ক নেই। কিন্তু ইঁদুরের তো মস্তিষ্ক আছে। তাহলে ইঁদুরের কি চেতনা আছে? যদি থেকে থাকে তাহলে সেটা কি মানুষের মত? আমরা ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে তার বুদ্ধি সম্পর্কে জানতে পারব। কিন্তু ইঁদুর এই জগতকে কী চোখে দেখে? তার অনুভূতি বা অভিজ্ঞতাটা কেমন? আমরা ব্যথা পেলে যে অভিজ্ঞতা পাই, ইঁদুরও কি তাই পায়? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা সম্ভব নয়। তাহলে আমরা কীভাবে বুঝব ইঁদুরের চেতনা আছে কি নেই?

আমরা সব কিছুকে জীব ও জড় হিসেবে ভাগ করতে পারি। অনেকে বলবেন – যারা জীব তাদের চেতনা আছে, আর যারা জীব না তাদের চেতনা নেই। আমরা জানি গাছ জীব কিন্তু এদের মস্তিষ্ক আছে বলে আমার জানা নেই। তাহলে গাছের কি চেতনা আছে? আমরা যখন গাছ কাটি, তখন কি গাছ ভয় পায়, কান্নাকাটি করে, ব্যথা পায়? আমরা জীব ও জড় নির্ধারণ করি বস্তুগত বা শারীরিক অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য দেখে। অথচ একটি রোবটও কিন্তু হাঁটতে-চলতে পারে। বিভিন্ন ধরনের সেন্সর ঠাণ্ডা-গরমের, স্পর্শের এমনকি দর্শনের অনুভূতিও নিতে পারে। যত দিন যাচ্ছে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার উন্নতি হচ্ছে এবং একদিন হয়তো রোবটরা নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধিও করতে পারবে। তাহলে কি এদের বস্তুগত বৈশিষ্ট্য দেখে বলা যায় এদের চেতনা আছে? মানব শিশুর কথা ধরা যাক। মানব শিশুর কি চেতনা আছে? ৩ মাস বয়সের একটি শিশু এই জগতকে কিভাবে দেখে? সে কি মায়ের ভালবাসা অনুভব করে? যাই হোক, প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের কথাই ধরা যাক। আমরা মনে করি আমাদের চেতনা আছে কারণ আমরা জগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা পাই, অনুভূতি পাই। আমরা মনে করি আমরা নিজেরা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করি, আমাদের ইচ্ছা আমাদের নিজস্ব, আমরা যা খুশি তাই করতে পারি। কিন্তু আসলেই কি তাই? আমাদের চরিত্র, আমাদের ইচ্ছা - এগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন কি? মস্তিষ্ক ও চেতনা নিয়ে বিভিন্ন ঘটনা ও গবেষণা এ সম্পর্কে সন্দেহ তৈরি করে। ১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যান্ডে এক অসাধারণ দুর্ঘটনা ঘটে। রেললাইনের কাজে একটা বড় পাথর সরাতে গিয়ে অনিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের ফলে সাড়ে তিন ফুট লম্বা সোয়া ইঞ্চি ব্যাসের ১৩ পাউন্ড ওজনের ভারী একটি সুচালো লোহার দণ্ড ফিনিয়াস গেজ নামের এক ব্যক্তিকে আঘাত করে। ভদ্রলোক পেশায় বিস্ফোরণ-বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং ওই বিস্ফোরণের তদারকি করছিলেন। লোহার ওই রড গেজ সাহেবের বাঁ চোখের ঠিক নিচে আঘাত করে  এবং মাথার খুলি ফুটো করে ৫০ গজ দূরে গিয়ে পড়ে। এই সাংঘাতিক দুর্ঘটনায়, দেখা গেল, গেজ সাহেবের কিছুই হয়নি। প্রচুর রক্তক্ষরণ হলেও তিনি দিব্যি সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু কিছুদিন পরে বোঝা গেল, আগের সেই নম্র-ভদ্র, কাজপাগল ভালো মানুষটি আর নেই তিনি। তার বদলে দেখা গেল নতুন এক গেজ সাহেবকে, যার মেজাজ বড়ই খিটমিটে, একটা বদমেজাজি বাচ্চা-ছেলের মতো ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠল। এই দুর্ঘটনার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, মানুষের চেতনার অস্তিত্ব তার মস্তিষ্কে। মস্তিষ্ক আঘাত পেলে মানসিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়। তার মানে আমার মস্তিষ্ক আঘাত পেলে আমি আর আমি নাও থাকতে পারি, বা বলা যায়, অন্য কোন আমি হয়ে যেতে পারি। এর চেয়ে হাস্যকর কোন কিছু আপনি নিশ্চয় কখনোই শোনেননি, আসলে আমিও শুনিনি। কিন্তু এটা যে মোটেই অবাস্তব না, গেজ সাহেবই তার প্রমাণ।

অনেকে বলবেন – মস্তিষ্কে চেতনার উৎপত্তি। এতে সমস্যাটা কোথায়? সমস্যা আছে। মানব মস্তিষ্ক বড়ই জটিল। এর কার্যকর কেন্দ্রগুলো বেশ বিস্তৃত, ঠিক কেন্দ্রীভূত নয়। অর্থাৎ, কোন একটি কাজের জন্য মস্তিষ্কের একাধিক অঞ্চল উদ্দীপিত হয়। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মস্তিষ্ক বাইরে থেকে সংকেত গ্রহণ করে। তারপর এর বহুধাবিস্তৃত নেটওয়ার্কের সাহায্যে দৃষ্টি, শ্রুতি, বাচন, মোটর স্নায়ুকোষ নিয়ন্ত্রণসহ অন্য বহু সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার পরিচালনা সম্পন্ন করে। কিন্তু এসব কাজ নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত থাকে না। বরং দেখা যায়, একাধিক অঞ্চলের সমন্বিত প্রক্রিয়ায় কোন একটি কাজ সমাধা হচ্ছে। অথচ মস্তিষ্ক বিকেন্দ্রীভূত হলেও আমার ‘আমিত্ব’ একটি একক অনুভূতি। আমাদের আনন্দ, কষ্ট, বেদনা, সুখ, দুঃখ – এসব অনুভূতিই একক সত্ত্বার চেতন-ফল। এর মধ্যে কোন ফাঁক নেই। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে – বিকেন্দ্রীভূত বস্তু মস্তিষ্কে কীভাবে একক অনুভূতি চেতনা বা আমিত্বের উদ্ভব ঘটে? আপনিই বলুন, আমার জানা নেই।

মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণায় ফেরত আশা যাক। আমরা সবাই জানি, দেহের বাম অংশের সব স্নায়ু ও ডান অংশের সব স্নায়ু পরস্পরকে আড়াআড়ি ক্রস করে মস্তিষ্কের যথাক্রমে ডান ও বাম অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মস্তিষ্কের ডান ও বাম অংশের মধ্যে আন্তঃসংযোগ থাকে। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে মৃগী রোগের চিকিৎসায় মস্তিষ্কের কর্পাস কলোসামকে বিচ্ছিন্ন করা হতো। এতে করে মস্তিষ্কের দুই অংশের মধ্যকার সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। একে স্প্লিট ব্রেইন বলে। স্প্লিট ব্রেইন  পরীক্ষায় দেখা যায়, মানুষের চেতনা কীভাবে মস্তিষ্কের আন্তঃসংযোগের ওপর নির্ভর করে।  সেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে চেতনাও খণ্ডিত হয়। স্প্লিট ব্রেইন রোগীর ক্ষেত্রে ডান চোখে দেখা বস্তু বাম মস্তিষ্কে যায়। অধিকাংশ মানুষের মস্তিষ্কের বাম অংশেই থাকে কথা বলার কেন্দ্রটি। তাই এ ধরনের রোগী শুধু ডান চোখে যা দেখে, তাই বলতে পারে। বাম চোখে যা দেখে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলেও কিছু বলতে পারে না। মস্তিষ্কের ডান-বাম সংযোগটি বিচ্ছিন্ন থাকায় কোন অংশ কী দেখছে, তা অপর অংশটি জানে না। এ সংক্রান্ত একটি বিখ্যাত পরীক্ষায় এক ব্যক্তির ডান চোখে বরফ পড়ার দৃশ্য ও বাম চোখে মুরগির পায়ের ছবি দেখানো হয়। তারপর তাকে একগুচ্ছ বিভিন্ন ছবির সংগ্রহ দিয়ে বলা হল যে তুমি যেমনটি দেখলে, তার সঙ্গে মেলে এমন ছবিটি চিহ্নিত কর। রোগীটি তার ডান হাত দিয়ে একটি কোদাল ও বাম হাত দিয়ে একটি মুরগির ছবি তুলে আনে। তার মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন ছবি দেখেছে এবং তদনুযায়ী সে ছবি পছন্দ করেছে। এ ক্ষেত্রে সে বরফ পড়ার ছবি দেখে বরফ সরানোর জন্য কোদাল পছন্দ করে, আবার মুরগির পা দেখায় মুরগির ছবি পছন্দ করে। দুটোই কিন্তু পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুইটি বিষয়। কিন্তু তাকে যখন প্রশ্ন করা হল, তুমি কেন মুরগির ছবির সঙ্গে কোদালের ছবি নিলে, তখন সে বলল, মুরগি থাকলে মুরগির ঘরও থাকবে, আর সে ঘর পরিষ্কার করতে কোদাল লাগবে। বোঝা যায়, এই রোগীর মস্তিষ্কের দুই সংযোগহীন অংশ আলাদাভাবে সচেতন। কিন্তু দুই অংশের মধ্যে কোন সংযোগ না থাকায় এবং বাম অংশে কথা বলার অংশটি থাকায় সেই অংশটি তার খণ্ডিত চেতনার একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে। এটা শুনে আপনি আর যাই হোক আমাকে পাগল বলতে পারবেন না, বললে মস্তিষ্ককে বলতে পারেন।

চেতন-সত্ত্বা বা ‘আমিত্বের’ ব্যাখ্যায় বিভিন্ন নিউরোসায়েন্টিস্ট, সাইকোলজিস্ট ও দার্শনিক একেক তত্ত্ব দিচ্ছেন। বিজ্ঞানীদের লাখ কথার এক কথা – মস্তিষ্কের কোন না কোন অংশের ক্রিয়া-তৎপরতার ফলে অভিজ্ঞতার একটা প্রতিরূপ ( বাইরের ইনপুট সিগন্যাল ও মস্তিষ্কের নিজস্ব প্রক্রিয়াকরণের ফলে উদ্ভূত আউটপুট সিগন্যাল) তৈরি হয়। এই প্রতিরূপ তখন একটি সামগ্রিক চেতনার অংশ হিসেবে উপস্থাপিত হয়। অর্থাৎ, বাইরের গৃহীত সংকেতের ওপর মস্তিষ্ক তার নিজস্ব কারিগরি খাটিয়ে একটা ফাইনাল সিগন্যাল তৈরি করে। এ রকম আরও বহু সিগন্যাল মিলেই ‘আমিত্বের’ একটা প্রবহমান অস্তিত্বের সৃষ্টি হয়। ঠিক কীভাবে, সেটা পরিষ্কার নয়, কিন্তু এমনটাই ঘটে। মস্তিষ্কের কোন নির্দিষ্ট অংশের নির্দিষ্ট কর্মশৃঙ্খলাকে যেহেতু চেতন-সত্ত্বার জন্য দায়ী করা যায়নি, তাই অনেক বিজ্ঞানীই এই মত পোষণ করেন, ‘আমিত্ব’ বলে কিছু নেই, পুরোটাই বিভ্রম। অর্থাৎ, আমাদের চেতনা একটি প্রবহমান কল্পনা। কিন্তু মানুষের মন এই ধারণা মানতে চায় না। কারণ এই লেখাটি আপনি সচেতনভাবে পড়ছেন, আঙ্গুলে পিন ফোটালে আপনি সাংঘাতিক ব্যথা পাবেন – এই যে চেতন সংঘটন, একে অস্বীকার করি কী করে? ‘আপনি একঝাঁক নিউরনের সংগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নন।’ – এই কল্পনাটি অধিকাংশ জীবিত মানুষের কাছে এতই বিস্ময়কর যে, এটি সত্যিই হতবিহ্বল করে দেয়।